ফকির

(গল্পগ্রন্থ – উপলখণ্ড)

ইচু মণ্ডলের আজ বেজায় সর্দি হয়েছে। ভাদ্রমাসের বর্ষণমুখর শীতল প্রভাত। তালি দেওয়া কাঁথা, ওর বৌ, তার নাম নিমি, শেষরাত্রে গায়ে দিয়ে দিয়েছিল। এমন সর্দি হয়েছে যেন মনে হচ্ছে সমস্ত শরীর ভারী। ইচু শুয়েই পা দিয়ে চালের হাঁড়িটা নেড়ে দেখলে, সেটা ওর পায়ের তলার দিকেই থাকে, হাঁড়িটাতে সামান্য কিছু চাল আছে মনে হলো তার।

ইচু বললে—আজ আর জনে যাব না। একটু পানি দে দিকি।

ওর বৌ বললে—জনে যাবে না তবে চলবে কিসি?

—কেন, চাল তো রয়েছে তোর হাঁড়িতি, সজনে শাক-মাক সেদ্দ কর আর ভাত। নুন আছে?

—এট্টু অমনি পড়ে আছে মালাটার তলায়।

—তবে আর কি? পানি দে—নামাজ করি।

ইচু জল দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ওজু শেষ করে ফজরের নামাজে বসে গেল। এটি তার জীবনের অতি প্রিয় কাজ বাল্যকাল থেকেই। মজুরি করতে না যেতে পারে সে, কিন্তু নামাজ না করে সে দিনের কাজ কখনও আরম্ভ করেনি।

নিমি বললে—উঠেছ যখন, তখন জনে যাও। আজকাল যুদ্ধের বাজারি দশ আনা করে জন, অন্য সময় তিন আনা হত যে। হাঁড়িতে যদি চাল থাকতি দেখলে, তবে আর তুমি জনে যাবা না! ও ভাল না।

ইচু বললে—নামাজের সময় ঘ্যান ঘ্যান করিস নে বাপু, একটু চুপ কর।

নামাজ শেষ করে ইচু দা হাতে বেরিয়ে যেতে গিয়ে একটু থেমে বললে—খিদে পেয়েছে। কি আছে রে?

—কিছু নেই।

—দেখ না হাঁড়িটা—বড্ড খিদে পেয়েছিল।

—দুটো-কটা পানি দেওয়া ভাত পড়ে আছে, আর কিছু নেই।

—তাই দে। বেনবেলা না খেয়ে গেলি দুপুর বেলা এমন খিদে পায়, দা ধরতি হাত কাঁপে। কাজ করতি পারি নে।

শাইলিপাড়া গ্রামের পাশ দিয়েই রেল লাইন চলে গিয়েছে।

রেল লাইন পার হয়ে ফাঁকা মাঠ একদিকে, মাঠের মধ্যে বিল, ভরা ভাদ্রের বর্ষায় থই থই করছে তার জল, ধারে ধারে কাশবনে সবে ফুল ফুটতে শুরু হয়েছে, জলে কলমি লতা জালের মত বিস্তৃত হয়ে আছে। বনখেজুর গাছের মাথায় তেলাকুচো লতার দুলুনি। টুকটুকে লাল তেলাকুচো ফল সবুজ পাতার আড়াল থেকে উঁকি মারছে। ফিঙে পাখি ঝুলছে রেলের তারে।

রামা গোয়ালা জন-মজুর নিয়ে ধান কাটছে তার নিজের জমিতে। ইচুকে দেখে বললে—যাবা কোথায়?

—সনেকপুরের বিলি ধান কাটতি।

—কত করে জন দেচ্ছ?

—সাত সিকি করে বিঘে। তামাকের আগুন দেবা?

—নিয়ে যাও, ওই বেনাঝোপের ধারে মালসা আছে।

—ভাত খেয়েই চলে আলাম, হাঁফ জিরুতে পারিনি। তামাক না খেলি কাজে মন বসে?

মালসা থেকে আগুন নিয়ে তামাক খেতে খেতে চলল ইচু।

ইচুর গ্রাম থেকে দু মাইল দূরে সনেকপুরের বিলে দেড়-শ দু-শ বিঘে জমিতে ভাদুই ধান পেকে গাছ শুয়ে পড়েছে। যেমন বর্ষা নেমেছে, দু-পাঁচ দিনে বিলের জল বেড়ে পাকা ধান ডুবিয়ে দেবে, তাই এবার মজুরির রেট এদিকে খুব বেশি। তার ওপর আছে মজুরদের একবেলা খোরাকি।

ইচুর বড় ভাল লাগে আল্লার কথা শুনতে। পায়রাগাছির ফকির এ অঞ্চলের মধ্যে নামজাদা সাধু। একবার ইচু তাঁকে দেখেছিল। বাল্যকাল থেকে ইচুর ঈশ্বরের দিকে কেমন এক টান। পায়রাগাছির ফকির সে টান আরও বাড়িয়ে দেন ওর। ইচু যেন কেমন হয়ে গিয়েছে তার পর থেকে। সংসারে মন দেয় না, মজুরি করে পয়সা রোজগারেরদিকে বা খাওয়া-দাওয়ার দিকেও মন নেই। কাস্তে হাতে জমির ধান কাটতে কাটতে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। অনেকে ওকে তা নিয়ে খ্যাপায়। বলে—ও ইচু, শেষকালে ফকির হবা নাকি গো? ইচু মুখে কিছু বলে না, চুপ করে থাকে। সে নিতান্ত ভালমানুষ, কারও কোনো কথার প্রতিবাদ সে করতে পারে না।

মজুরির রেট নিয়ে দরাদরি করতে পারে না বলে অনেকে ওকে ঠকিয়ে কাজ আদায় করে। বিনি মজুরিতে অনেক সময় খাটিয়ে নেয়।

—ও ইচু, আমার বাড়ির চালকুমড়োর মাচাটা তুমি থাকতে নষ্ট হয়ে যাবে?

—কেন, কি হয়েছে চাচা?

—খুঁটিগুলো সব পড়ে গিয়েছে।

—ওবেলা এসে করে দেবানি চাচা।

ইচু কথা ঠিক রাখত নিজের। যাকে যা বলবে, তা সে রাখবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করবে এটা সকলেই জানে। মহাজনে দু তিন বিশ ধান মুখের কথায় ওকে দিয়ে দিত, এ পর্যন্ত সে কারও টাকা বা ধান মেরে দেয়নি।

একবার পাশের গ্রামের মুখুজ্যেদের জমির ধান সে ভুল করে কেটে ফেলেছিল—বেশি নয়, কাঠাখানেক জমির পাকা ধান। মুখুজ্যেদের জমির পাশে তখন ওর নিজের ওটবন্দি জমি ছিল দু বিঘে। মুখুজ্যে মশায় যখন জানতে পারলেন তাঁর জমির ধান কে কেটে নিয়েছে, তখন খুব হই-চই জুড়ে দিলেন। কে ধান কেটেছে সন্ধান করতে পারলেন না, কারণ সবারই তখন ধান কাটবার সময়, সকলেরই বাড়িতে ধান—কার ধান তিনি গিয়ে ধরবেন? দিন-দুই পরে ইচু গিয়ে সন্ধ্যাবেলা তাঁর বাড়ি হাজির হলো।

মুখুজ্যে মশায় বললেন—কি রে ইচু, কি মনে করে?

ইচু বললে—সালাম বাবু! একটা বড্ড ভুল করে ফেলিছি!

—কি রে?

—আপনার জমির ধান কাঠাখানেক কেটে ফেলে ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলেলাম। তা বাবু, দেড়া সুদ দিয়ে সেই ধানডা আপনারে ফেরত দিতে চাই।

—ওঃ, তোর কাজ ইচু! আমি আকাশ-পাতাল হাতড়াচ্ছি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু। সেদিন বড্ড বর্ষা, জমির আল ঠিক করতি পারলাম না। তার পর পরস্পর শুনলাম আপনার জমির ধান কে চুরি করেছে বলে আপনি খোঁজ করছেন। তখন ভাবলাম বাবুরে বলে আসি। ক্ষেতি লোকসান যখন অজান্তে করে ফেলেছি, তখন দেড়া বাড়ি সুদ দেব আপনারে।

মুখুজ্যে মশায় বিশ্বাস করলেন ওর কথা। ইচুকে অন্তত চোর বলে কেউ সন্দেহ করবে না। ইচু জন খেটে খায় বটে, কিন্তু আশেপাশে চার-পাঁচ গ্রামের লোক ওকে মনে মনে শ্রদ্ধা করে। মুখুজ্যে মশায় বললেন, তোকে

সুদ দিতে হবে না ইচু, আমার ধান যা কেটেছিস ও আর ফিরিয়েও দিতে হবে না। ও তোকে দিলাম। ভুলে করেফেলেছিস তা আর এখন কি হবে।

ইচু হাতজোড় করে বললে—তা হবে না মুখুজ্যে মশায়, ও ধান নিতি পারব না, মাপ করবেন। ও ধান আমার গলা দিয়ে নামবে না। আল্লা যা আমায় হাতে তুলে দেবেন, তাই খেয়ে পরান বেঁচিয়ে রাখব—যা না দেবেন সে আমার হারাম।

মুখুজ্যে মশায় জানতেন ইচুকে। খুশি হয়ে বললেন—যাক, দুটো চিঁড়ে নিয়ে যা, বাড়ির মধ্যে তোর কাকিমার কাছ থেকে চেয়ে নে।

সনেকপুরের বিলটায় পৌঁছে ইচু দেখলে, জন-মজুর এখনও কেউ এসে পৌঁছয়নি। এটা পছন্দ করে না সে। বেশি রেটে মজুরি নেব অথচ কাজে আসব দেরি করে, মালিকের কাজে ফাকি দেব, এ তার ভাল লাগে না। ধান কাটে ঘড়ির কাঁটার মত। এ কাজে তার ফাঁকি নেই।

পথ-চলতি লোকে জিজ্ঞেস করে—কি ধান এটা গো?

—বেনাঝুপি।

—এবার ফসল কেমন?

—আড়াই বিশ থেকে তিন বিশ পড়তা হতি পারে।

—বিঘেয়?

—বিঘেয় না কি কাঠায়?

ইচু হা হা করে হাসে পথিকের অজ্ঞতায়। পথিকের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলে—কাঠায় আড়াই বিশ ধান ফলন হলি কি আমরা জন খেটে খাতাম গো কর্তা? হ্যা—হ্যা—হ্যা—

—বাড়ি কোথায় তোমার?

—শাইলেপাড়া।

—নাম?

—ইচু মণ্ডল।

বেলা আড়াইটের গাড়ি দূরের রেল লাইন দিয়ে গড় গড় করে চলে গেল। জনমজুরদের জন্যে জমির মালিক খাবার পাঠিয়েছে, একজন লোকে বাঁকে ঝুলিয়ে আধক্রোশ দূরবর্তী সনেকপুর গ্রাম থেকে কাঁসার জামবাটিতে সাজিয়ে এনেছে গরম ভাত, কুমড়োর ঘণ্ট ও কুচো চিংড়ি ভাজা। এ সময় ভাল খেতে দিয়ে মন খুশি করা মানে বেশি কাজ আদায় করা ওদের কাছ থেকে। জমির মালিকেরা তা জানে। আখের মণ্ডল খেতে খেতে বলে—আজ এটটু সকাল সকাল যাব। মোর ঘরে নুন নেই—বাজার থেকে নুন না নিয়ে গেলি বাচ-কাচ খেতি পাবে না।

—নুন কনে পাবা? বাজারে কালও খোঁজ করিছি, নুন মেলে না।

—ওমা, আলুনি খেয়ে খেয়ে মুখি তো পোকা পড়ে গেল।

—আর অন্ধকারে খেয়ে খেয়ে চকি ঢ্যালা বেরুল। কেরাচিন্নি তেলের মুখ দেখিনি কতকাল।

—কুমড়োর ঝালডা করেছে বেশ। সনেকপুরের এরা খেতি দেয় ভাল, পেটটাভরি খেতি দেয়। কেরাচিন্নি পাবা কোথায়?

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আখের মণ্ডল দা-কাটা তামাক সাজলে কলকেতে। বেশ করে আগুন ধরিয়ে প্রবীণ রমজান মণ্ডলের হাতে দিয়ে বললে—হ্যাদে ধর চাচা।

ইচু বললে—চাচা, তোমার বয়স হলো ক কুড়ি?

—তা যেবার জোড়া বন্যে হয়েল সেবার আমি গরু চরাতে পারি, তিরিশ কি চল্লিশ হলো পেরায়—

কেউ বিশেষ বুঝতে পারলে না। জোড়া বন্যা কত বৎসর পূর্বে কোন্ সালে হয়েছিল কেউ জানে না। রমজানের বয়স কম হলেও সত্তর ছাড়িয়েছে। যখন সে গরু চরায় তখন এরা কেউ জন্মায় নি। সংখ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান এদের নিতান্তই সীমাবদ্ধ।

বেলা যায়-যায়। পাঁচটার গাড়ি গড় গড় করে মাদলার বিলের ওপর দিয়ে চলে গেল। ঝিঙের ক্ষেতে ফুল ফুটেছে সনেকপুরের মাঠে। নোয়ালি সর্দার জাতে বুনো, সনেকপুরের মধ্যে অবস্থাপন্ন, গরুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে গ্রাম্যপথ ধরে। ইচু সন্ধ্যার নামাজ শেষ করে উঠতেই বেড়ার ধার থেকে নোয়ালি সর্দার বললে—ও ইচু, কাল আমায় জন দিতি পারবা?

—না গো।

—কেন?

—সনেকপুরওয়ালাদের বিলির ধান কাটা হচ্ছে।

—চল আমার বাড়ি, তামুক খেয়ে যাবা।

—রমজান মণ্ডলকে ইচু ডাক দিলে।—ও চাচা, সর্দারের বাড়ি তামুক খাবা চল।

নোয়ালি সর্দারের তামুক খাওয়ানোর আসল উদ্দেশ্য মজুরির রেট সম্বন্ধে দরদস্তুর করা। ইচু রমজানের পুত্রের বয়সি—সুতরাং দরদস্তুর সম্বন্ধে রমজান নেতা হয়ে কথাবার্তা চালালে।

—সাত সিকের কম পারব নি গো, এতে তুমি রাগ করো না সর্দার।

—রমজান চাচা, তার চেয়ে আমার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেল না কেন?

—অনেয্য তো কিছু বলছি নে।

—অনেয্য নয় চাচা? যা ছেল চোদ্দ আনা তাই সাত সিকে? এট্টা ভেবে চিন্তে কথা বল। পাঁচ সিকে কর, আর চাল ডাল মাছ পেটিয়ে দেবানি তোমরা রান্না করে খেয়ো। মোদের রান্না তো তোমরা খাবা না। আমার পুকুরি এবার এই এত বড় বড় চ্যাং মাছ—

নোয়ালি সর্দার হাত দিয়ে কাল্পনিক মৎস্যের দৈর্ঘ্য নির্দেশ করলে, যদি লোভ দেখিয়ে এদের কাজে টানা যায়।

রমজান ঘাড় নেড়ে বললে—ও হবে না সর্দার। সাত সিকের কম করলি—

—আর এক কলকে ধরাও চাচা! হ্যাদে, গাছের জালি শসা গোটাকতক নিয়ে যাও। দু'জনে খেয়ো।

—শসা পুঁতেছিলে? মাচার শসা, না মেঠো?

—মেঠো কোথায় পাব চাচা, এই উঠোনটাতে মাচা করে দিয়েলাম—সিম বরবটি শসা—কিনে খাবার তো ক্ষ্যামতা নেই মোদের, তরিতরকারির আগুন দাম।

—সে কথা আর বলো না। হাটে বাগুন কেনতাম পয়সায় দু সের তিন সের—তাই এখন বলে আটা আনা সের। খাদ্য-খাদক উঠে গেল। ঝিঙে আছে?

তা তোমার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে—দুটো কটা দেবানি তুলে, খেয়ো।

—যাক গে, পাঁচ সিকেই দিয়ো সর্দার, কারও কাছে পেরকাশ করো না যেন এ কথা।

ইচু ও রমজান তামাক খেয়ে ঝিঙে ও শসা নিয়ে উঠে চলে এল। নেয়ালি সর্দারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। সে জানে রমজান জন-মজুরের নেতা, ওর কথায় দরদস্তুর ঠিক হয়। ওকে খুশি রাখলেই হোল।

ইচুর বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গেল। নিমিকে বললে—ভাত রেঁধেছিস?

—এ বেলা শরীরডে খারাপ। পানি দেওয়া ভাত আছে, খাও।

—তরকারি?

—কিছু নেই।

—এই ঝিঙে কটা রেঁধে দে।

—রাঁধব কি দিয়ে, তেল কনে? পাঁচ পলা ধার করে এনেলাম আছিরন বিবির কাছ থে। এখনও শোধ দিতে পারিনি—আবার কি ধার করতি ছোটব?

—পোড়া?

নিমি খিল খিল করে হেসে উঠে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বললে—ও মা, মুই কনে যাব গো! ঝিঙে পোড়া কেউ কখনও শুনিনি। খেতি পারবা না।

—পারব পারব। দে তুই।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলো পাকাটির আলো জ্বেলে। তেল নেই। অন্ধকার ঘরদোর। কে আসে, কে যায়, কিছু বোঝা যায় না। কচুঝাড়ে কেয়োঝাঁকার ঝোপে জোনাকি জ্বলছে, উঁচু-নিচু—উঁচু-নিচু। দেবতা ঝিলিক মারছে, রাত্রে বৃষ্টি হবে বোধ হয়। ভাদ্রের গুমট গরম। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পরে ইচু যেমন মাদুর পেতে শুয়ে পড়েছে তখনই রাজ্যের ঘুম এসেছে ওর চোখে। আর জ্ঞান নেই।

কতক্ষণ পরে সে জানে না, লোকজনের গোলমালে ইচু শেখের ঘুম ভাঙল। অনেক লোকের গলা বাইরে। ওরই বাড়ির উঠোনে।

—ব্যাপারখানা কি?

পাড়ার মোড়ল হাফেজ বুলোর গলা—ও ইচু, ইচু বাড়ি আছ?

বছিবদ্দি শেখ ডাকছে—ও ইচু, বলি ওঠ—শোন ইদিকি।

ভোর সবে হয়েছে। কি-পক্ষী ডাকতে শুরু করেছে। ইচু ধড়মড় করে উঠে বসেচোখ মুছলে। ফজরের নামাজের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু এত লোক ওর উঠোনে কেন? তাকে ডাকাডাকিই বা কিসের এত সকালে? বাইরে এসে ঘুমচোখে উঠোনের দিকে চেয়ে ও অবাক হয়ে গেল। পাড়াসুদ্ধ মানুষ সব ওর উঠোনে। সে বিস্মিত সুরে বললে—কি হয়েছে গো মোড়লের পো?

বুড়ো হাফেজ মণ্ডল বললে—ইদিকি এস।

—আগে নামাজটা করে নিই—দেরি হয়ে গিয়েছে।

ইচু ঘরের পেছনের দাওয়ায় নামাজ সেরে নিয়ে আবারসামনে এল। সবাই ওর দিকে একসঙ্গে এগিয়ে এল। সবাই মিলে যেন একসঙ্গে ওকে কি বলতে চায়। ইচু ক্রমেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে, ওর বুকের ভেতর ঢিপ ঢিপ করছে। ভয়ও হয়েছে ওর, নিমি এ সময়ে কোথায় গেল? হয়েছে কি?

অন্য সবাইকে থামিয়ে দিয়ে হাফেজ বললে—এস মোর সঙ্গে।

ইচু শেখ ওদের পেছনে পেছনে কলের পুতুলের মত চলল। রেল লাইনের দিকে সকলেই যাচ্ছে। নাবাল ক্ষেতের একহাঁটু জল পার হয়ে সবাই রেল লাইনে উঠল। একটা খেজুর ঝোপের আড়ালে রেল লাইনের ওপর উঠে সবাই দাঁড়াল থমকে। হাফেজ ডেকে বললে—এখানে এস।

কি ব্যাপার? ইচু এগিয়ে গিয়ে যা দেখলে তাতে তার মাথা ঘুরে গেল, সে নিজেকে পড়তে পড়তে সামলে নিলে। রেল লাইনের ওপরে একটা রক্তাক্ত মৃতদেহ—গলা সামনের দিকে গভীরভাবে কাটা, দেহের সঙ্গে একটি অস্বাভাবিক কোণের সৃষ্টি করে চিৎ হয়ে পড়ে আছে।

মৃতদেহ নিমির।

তার পর তার ভাল কিছু মনে পড়ে না। গ্রামের লোকে মিলে তাকে কত কিছু প্রশ্ন করতে লাগল। সে কোথায় ছিল, নিমি কতক্ষণ ঘরে ছিল, নানা প্রশ্ন। নিমি রেলে গলা দিয়ে মরেনি, তাকে নাকি খুন করে টেনে এনে রেলে শুইয়ে রাখা হয়েছে। তার চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। ইচু বুঝতে পারলে তার ওপর অনেকের সন্দেহ এসে পড়েছে। পাশের গাঁয়ে দফাদারদের সংবাদ দিতে লোক যাবে এখুনি, তার আগে ইচুকে একবার জিজ্ঞেস করা দরকার, সে কোথায় ছিল তা জানা দরকার, সেইজন্যেই গ্রামের লোকতার বাড়িতে গিয়ে ডাকাডাকি করছিল।

ইচু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে বললে—মুই কিছু বলতে পারি নে চাচা, আল্লা জানে। মুই মড়ার মত ঘুমুতি নেগেলাম।

—বউরি কিছু বললে?ঝগড়া হয়েল?

—কিছু না চাচা।

—বউ ঘরে শুয়েল?

ইচুর মনে একটা ভয়ানক সন্দেহ উঁকি মারলে। এ প্রশ্ন করে কেন লোকে? বছিরদ্দি শেখ এগিয়ে এসে ওকে উঠিয়ে বললে—মোর কথা সবাই শোন। ইচু সে রকমলোক নয়। চল এখুনি বনগাঁয়ে ওকে নিয়ে মোক্তার বাবুদের কাছে। বিহিত কথা তাঁরা বলবে, তাঁদের পরামর্শটা নেওয়া দরকার। এখানে থাকলি এখুনি দফাদার এসে ওকে বাঁধবে। তার আগে চল মোরা ছ-সাত জন ওরে নিয়ে বনগাঁয়ে যাই। পরামর্শ লিয়ে ফেলি। পুলিশ গ্রেপ্তার করবার আগেই। কে কে যাবা?

দেখা গেল প্রায় সকলেই যেতে চায়।

ইচু ভগ্নস্বরে বলে—কিন্তু উকিল মোক্তার বাবুদের ট্যাকা মুই কন থে দেব? মোর হাতে একটা ট্যাকা আছে কালকার জনের দরুন। তাতে হবে?

হাফেজ বললে—ট্যাকার জন্যি তোমার ভাবনা হচ্ছে কেন। তোমার জান যদি বাঁচে কত টাকা হবে। সে ভাবনা মোদের। তুমি চল দিনি। কি বল বছিরদ্দি?

বছিরদ্দি বললে—তা নিচ্চয়। টাকার জন্যি তুমি ভেবো না। সে মোরা দ্যাখব।

হাফেজ বললে—রেল লাইন ধরে চল যাওয়া যাক। সোজা রাস্তা দিয়ে গেলি পুলিশি ধরবে।

বেলা সাড়ে সাতটার মধ্যেই ওরা বনগ্রামের বড় মোক্তার রামলাল চাটুজ্যে মশায়ের বাসায় পৌঁছে গেল। রামলালবাবু বেশিক্ষণ ওঠেননি, সেরেস্তায় বসেই চা খাচ্ছেন এবং মুহুরি দুলাল চক্রবর্তীকে বিলম্ব করে আসার জন্যে তিরস্কার করছেন—কাল চলে গেলে কাছারি থেকে বাড়ি, জামিননামা দুটো সই করাতে হবে, তোমার সে খেয়াল থাকে না। এখন এলে আটটার সময়—এমন করলে কি করে আমি কাজ চালাই? ওদের দরখাস্তের নকল নেওয়া হয়েছে?

—আজ্ঞে, নকলের জন্যে দরখাস্ত করা হয়েছে। কাল বিনয়বাবু সকাল সকাল চলে গিয়েছিল, দেখা পাইনি।

—সকালে কাছারিতে গিয়ে আজ নকল দুখানা বার করে ফেল আগে—নইলে জেরাই হবে না। কে? কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

হাফেজ মণ্ডল এগিয়ে এসে নীচু হয়ে ডান হাত তুলে কপালে ঠেকিয়ে বললে—সালাম, বাবু।

—কি ব্যাপার? বাড়ি কোথায়?

হাফেজ মণ্ডল বললে—বিপদে পড়ে অ্যালাম বাবুর কাছে। বড় বিপদে পড়ে গিয়েছি। খুনের ফ্যাসাদ।

রামলালবাবু প্রবীণ মোক্তার। মোক্তারি ব্যবসায় চুল পাকিয়েছেন—শক্ত কেসে লোক যখন পড়ে, তখন দিগ্বিদিগজ্ঞানশূন্য হয়ে পয়সা খরচ করে, ধীরভাবে সে পয়সা আদায় করতে হয়। সুতরাং একটা সিগারেট ধরিয়ে (প্রবীণ হলেও রামলালবাবু তামাক খান না, সিগারেটখোর) আরাম করে টান দিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন—খুন? কি রকমখুন?

হাফেজ ইচুর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—এই লোকের বৌকে গলা কাটা অবস্থায় কাল রাতে রেল লাইনে পাওয়া গিয়েছে।

—ওর নাম কি?

—ইচু।

—ও রাত্রে কোথায় ছিল?

—বাড়িতেই শুয়ে ছিল বাবু।

—বৌ-এর স্বভাবচরিত্র কেমন?

হাফেজ চুপ করে রইল। সে প্রবীণ লোক, গ্রামের মোড়ল—তার মুখ দিয়ে আর ও কথা বার হয় কেন? বছিরদ্দি শেখ পাশ থেকে ঈষৎ গলা খাঁকার দিয়ে নিয়ে বললে—বাবু, ভাল না।

ইচু অবাক হয়ে বছিরদ্দির মুখের দিকে চেয়ে রইল। নিমির স্বভাবচরিত্র ভাল ছিল না?কই, একদিনও তো সে কিছু জানে না! সে নিমির স্বামী, সে-ই কেবল জানে না, আর সবাই জানে!

হাফেজ চুপ করেই রইল। বছিরদ্দি বলে যেতে লাগল—বাবু, এ লোক বড্ড ভালমানুষ—নিরীহ ভালমানুষ। ও কিছু জানে না এসব কথা। খুনও ও করেনি।

রামলাল মোক্তার বাধা দিয়ে ধমকের সুরে বললেন—তুমি কি করে জানলে? তোমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে লোকে খুন করবে নাকি? যা তুমি জান তাই বল, যা জান না তা নিয়ে জ্যাঠামি কোরো না। যাও বসো ওখানে।

পরে হাফেজের দিকে চেয়ে বললেন—তুমি কি জান বল মোড়ল।

বছিরদ্দির অবস্থা-বিপর্যয়ে হাফেজ একটু ভয় খেয়ে গেল। সমীহ করে সংযত হয়ে বললে—আজ্ঞে বাবু যা বলছেন, অতি লেহ্য কথা। তবু ইচু আমাদের লোক ভাল। সবাই এ কথা জানে। আপনি সব লোককে জিজ্ঞেস কর, সবাই একথা বলবে।

রামলালবাবু সিগারেটে টান দিয়ে বললেন—ঘটনা বল।

হাফেজ ঘটনা বর্ণনা করলে। ইচু মণ্ডলের মুখে যা সে শুনেছে। জন খেটে এসে অঘোরে ঘুমুচ্ছিল, সবাই গিয়ে ডেকে ওর ঘুম ভাঙায়। ও বলেছিল, রাত্রে ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়ে ছিল, কি হয়েছে না হয়েছে কিছু জানে না। শোবার আগে ওর স্ত্রী ওকে ভাত খেতে দিয়েছিল। ঝগড়া-বিবাদ হয়নি।

—আত্মহত্যা নয়?

—না বাবু। গলায় অস্তরের দাগ দেখলিই বোঝা যায়। গলা কেটে রেল লাইনি ফেলে রেখেছিল।

রামলালবাবু বললেন—অন্তত তাই প্রিজামশন হবে। পুলিশেও তাই বলবে। লাশ দেখে কে আগে?

—বাবু, মোর ভাই আর নবি শেখ সকালে রেল লাইনের ধারে নালায় মাছ ধরতি যাচ্ছিল, তারাই দেখতি পায়। পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে আমারে খবর দেয়। মুই তখনি দৌড়লাম লাইনির ধারে।

—আচ্ছা আচ্ছা বুঝেছি, থাক। সুরতহাল আগে হয়ে যাক, তার পরে দেখা যাবে।গ্রামের দফাদারকে খবর দিয়ে এসেছ তো? বেশ করেছ। বড্ড শক্ত কেস। সন্দেহ গিয়ে ইচু মণ্ডলের উপরই পড়বে। বৌ-এর স্বভাবচরিত্র খারাপ ছিল। ভালমানুষ লোক হঠাৎ রেগে উঠলে এসব ক্ষেত্রে ভয়ানক হয়ে ওঠে কিনা। তোমরা লুকিয়ে চলে এসেচ?

—হ্যাঁ বাবু।

—একটা কথা শিকিয়ে দিই। ইচু?

ইচু এগিয়ে গিয়ে সেলাম করে দাঁড়াল। তার পা-দুটো ঈষৎ কাঁপছে।

—বলি শোন। তুমি খুন করেছ কি না করেছ তা আমি তোমায় জিজ্ঞেস করব না। আমাদের তা কাজ নয়। আমরা ধরে নেব তুমি খুন করনি। কিন্তু পুলিশে তা শুনবে না। তোমাকে আজ সম্ভব রাস্তায় যেতে যেতেই গ্রেপ্তার করবে। তোমায় স্বীকার করাবার জন্যে নানারকম চেষ্টা হবে। কিন্তু কিছুতেই তুমি বলো না যে তুমি খুন করেছ। স্বীকার কিছুতেই করবে না। করেই থাক বা না-ই করে থাক। বুঝলে? যাও, সাবধানে যাও।

হাফেজ বললে—বাবু, পুলিশি ধরলি রাখবে কনে ওরে?

—রাখবে হাজতে। যতদিন না বিচার শেষ হয়। তবে এখানে শেষ বিচার হবে —দোষী প্রমাণ হলে দায়রায় চালান হবে যশোরে। সেখানে জজসাহেব বিচার করবেন। বাড়ি গিয়ে পয়সা-কড়ি জোগাড় কর গিয়ে—বড্ড ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছ—অনেক টাকার খেলা।

হাফেজ ও বছিরদ্দি সব শুনে যেন মাটির মধ্যে বসে গেল। বনগাঁয়ে মোক্তারবাবুর টাকাই জোগাড় হয় না, আবার যশোর জেলায় কোর্টের উকিলবাবুদের টাকা গরিব গ্রামের লোকের চাঁদায় কি জোগাড় হয়ে উঠবে? ইচুকে বাঁচানো মুশকিল হয়ে উঠল।

এতক্ষণ পরে ইচু কথা বললে। এতক্ষণ সে একটি কথাও বলেনি। এইবার সে হাত জোড় করে বললে—বাবু, মোর একটি কথা বলবার আছে।

ওর মুখের দিকে সবাই চাইলে। মোক্তারবাবুও চাইলেন। এইবার বোধহয় সব প্রকাশ করতে চাইছে লোকটা। এইরকম ভাবেই বলে, তিনি জানেন। হাফেজ ও বছিরদ্দি মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। কি জানি ওর পেটে কি আছে। মানুষকে সব সময়ে বাইরে থেকে চেনা যায় না।

রামলাল মোক্তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলেন। ভাবটা এই রকম—বলে ফেল বাপু যা আছে পেটে। অমন অনেক ঘুঘুই আমরা দেখলাম, তুমি এখন বাকি আছ।

ইচু রামলালবাবুর পা-দুটো জড়িয়ে ধরে বললে—বাবু, মোর একটা দরবার আছে। যাতে হয় আপনি তা দেখবেন—মুই গরিব লোক, জন খেটে খাই, আপনার পয়সা হয়তো মুই দিতি পারব না, গরিব বলে দয়া করে একটা আবদার রাখবেন মোর—আল্লা দীনদুনিয়ার মালিক, আপনার ভাল করবে।

—আহা-হা, পা ছুঁয়ো না—কি-কি বল—

বাবু, ঝেখানে মোরে রাখে, ঝা করে ক্ষেতি নেই। কিন্তু বাবু, আপনি এইটেতাদের বলে দেবেন, ব্যবস্থা করে ঝেন পাঁচ-ওক্ত নামাজ আমি সেখানে পড়তি পারি—আর কিছু আমার বলবার নেই বাবু।

রামলালবাবুর সেরেস্তায় বজ্রপাত হলেও লোকটা অতটা চকিত হোত না সেকালের নভেলের বর্ণনা অনুযায়ী)। হাফেজ ও বছিরদ্দি আবার পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। ঘুঘু মোক্তার রামলাল চাটুজ্যে হাঁ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। এ রকম কথা এ সময় তিনি সামান্য একজন গ্রাম্য লোকের মুখ থেকে আশা করেন নি। যে খুনের দায়ে আজ পথেই হয়তো পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হবে, আজ বাদে কাল যাকে দায়রায় চালান দেওয়া হবে—শত অসুবিধা, অর্থনাশ, নির্যাতন যার সামনে, আর আইনের খাঁড়া যার মাথার ওপর ঝুলছে—নিষ্ঠুর নিয়তির হৃদয়হীন রক্তাক্ত ইঙ্গিতের মত।

রামলালবাবুই সেদিন বার লাইব্রেরিতে গিয়ে গল্প করেছিলেন—সত্যি অবাক হয়ে গেলাম ভায়া, যখন লোকটা ও কথা বললে। আজ যাকে পথেই অ্যারেস্ট করবে পুলিশ, কাল পুরবে হাজতে, যার সব যেতে বসেছে—সে যে ওই ধরনের রিকোয়েস্ট করতে পারে তা আমার মাথায় আসেনি। আমি আগে ভেবেছিলাম বুঝি কনফেস করবে। সামান্য একজন লোক—আমার চোখে জল এসে পড়ল ভায়া।

ওরা সব চলে গেল। ইচু শেখকে ওরা বাজার থেকে পেটভরে তেলেভাজা সিঙাড়া কচুরি আর মুড়ি খাওয়ালে। হাফেজ বললে—ওরে চাড্ডি হোটেলের ভাত খাইয়ে নিলি হোত। পুলিশি ধরলি কোথায় নিয়ে যাবে, আজ খাওয়া হবে কি না ঠিকতো নেই।

কিন্তু অত সকালে হোটেলে ভাত পাওয়া গেল না।

রাস্তা চলতে লাগল সবাই। দুপুরের কিছু দেরি আছে, ইচু পথের পাশে এক বটতলার ছায়ায় নামাজ পড়তে বসল। আর কোনো কথা ওর মনে থাকে না। ঝিরঝিরে হাওয়ায় আজ পথের ধারের গাছতলায় অপূর্ব আনন্দ ও শান্তি নেমে আসে প্রাণে নামাজের সময়। সে সব ভুলে যায়। চোখে যেন জল আসে। নিমি কত ভাত রেঁধে দিয়েছে—কত আদরযত্ন করেছে। তার চরিত্র খারাপ ছিল? সে কিছু জানে না। নিমির জন্যে বুকের মধ্যে একটা বেদনা। নিমিকে সে খুন করবে? কাউকে কখনও খুন করার কথা তার মনে আসেনি। আল্লা সাক্ষী আছেন সব কাজের। ভয় কি? মালিক যা করবেন তাই হবে।

রাস্তায় ওকে পুলিশে ধরলে না। বেলা দুটোর সময় বাড়ি ফিরে ওরা দেখলে পুলিশ দফাদার অপেক্ষা করছে ওদের পাড়ার বড় মোড়লের বাড়ি। লোক গিজগিজ করছে। ডাক-হাঁক, সাক্ষীর জবানবন্দি হতে বিকেল হয়ে গেল। শাইলিপাড়া গ্রামের সবাই একবাক্যে দারোগার সামনে বললে ইচুর দ্বারা এ খুন হয়েছে তারা কেউ বিশ্বাস করে না। জবানবন্দিতে আরও প্রকাশ পেল, ইচুর স্ত্রী নিমি প্রায়ই রাত্রে স্বামীকে ঘুম পাড়িয়ে বাড়ি থেকে বেরুত। গ্রামের মধ্যে তার প্রেমিকের অভাব ছিল না। প্রেমেরপ্রতিদ্বন্দ্বিতাও চলত। দারোগা ইচুকে সামনে ডাকিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করলেন। শেষে বললেন—তুমি কিছু জানতে না যে, তোমার স্ত্রীর চরিত্র খারাপ?

—না, দারোগাবাবু। কিছু জানি নে মুই।

—জান এতে চালান দিলে তোমার ফাঁসি হতে পারে?

—আল্লার ঝদি তাই মর্জি হয়, মোর মনে এতটুকু খেদ থাকবে না দারোগাবাবু—তেনার ঝা মর্জি তাই তিনি করুক। মুই খুসি ছাড়া অখুশি হব না।

বুড়ো হাফেজ মণ্ডল এগিয়ে এসে দৃঢ়কণ্ঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে—কাকে কি বলছেন বাবু? আল্লার কথা উঠলি ওর চোখ দিয়ে পানি পড়ে। অমন লোক এ দিগরে নেই।

দারোগাবাবু বললেন—তুমি কাল রাত্রে কোথায় ছিলে?

—ঘরেই শুয়ে ছেলাম। মড়ার মত ঘুম এসেচে চকি, সনেকপুরের বিলি জন খাটেলাম সারাদিন। ওনারা ডাকলে সকালবেলা, তখন মুই ঘুম ভেঙে উঠি।

দারোগাবাবু অভিজ্ঞ লোক, পুলিশের চাকরি অনেকদিন করছেন। কে সাধু কে বদমাইস চেনেন, ইচুর দ্বারা এ কাজ হয়নি ওর মুখের দিকে চেয়ে তখনই বিদ্যুতের লেখা বাণীর মত তাঁর মনের মধ্যে এ সত্য উদয় হোল।

সেই সন্ধ্যায় ইচু নামাজ সেরে ভাঙা খালি ঘরে ঢুকতেই ওর প্রাণটা হা হা করে উঠল।

—নিমি, ও নিমি, মোরে ভাত এনে দে।

সে আপন মনেই ডাকল। নিমিকে সে কত ভালবাসত, যে যা বলে ওসব সে বিশ্বাস করে না। বিচার করবার সে কেউ নয়। নিমিকে সে ক্ষমা করেছে।

—নিমি, ও নিমি, মোরে ভাত এনে দিলি নে?

পরদিন গ্রামের লোক সকালে উঠে ইচুকে আর তার ঘরে দেখতে পেলে না। সে একবস্ত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছে কখন। গৃহস্থালির কলসী, হাঁড়িকুড়ি, নারকোলের মালা, দু-একখানা পিতলের ঘটিবাটি সব ফেলে রেখে গিয়েছে।

খলসেখালি গ্রামের প্রান্তে নদীতীরে তেঁতুলগাছের তলায় পর্ণকুটিরে একজন ফকির কোথা থেকে এসেছে। সন্ধ্যায় আকাশের নীলপটে মেঘের রচনার সঙ্গে সঙ্গে সে খেজুরচটা বিছিয়ে নদীর ধারে যখন নামাজ পড়ে, তখন লোকে সবিস্ময়ে তার মুখে দেখেছে এক অদ্ভুত আলো, প্রভাতী তারার মৃদু জ্যোৎস্নার মত। এক সন্ধ্যা ভিক্ষাই তার উপজীবিকা। সবাই ওকে মানে, ভক্তি করে। নাম ওর ইচু ফকির।